চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়লেও অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়েনি

আবুল খায়ের

প্রকাশ : ০৬ জুন ২০২৬, ০৮:০০

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

দেশব্যাপী সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সংখ্যার তুলনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং এর অধিনস্থ বিভাগীয়, জেলা ও স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রশাসনের পক্ষে সীমিত জনবল দিয়ে নিয়মিত মনিটরিং সম্ভব নয়। ঐসব বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর বেশির ভাগই পরীক্ষা নিরীক্ষা কিংবা নামেমাত্র আইসিইউ খুলে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

অনেক রোগীর হয়তো অস্ত্রোপচার কিংবা সিজার করার প্রয়োজন নেই। তারপরও ঐসব রোগীর অস্ত্রোপচার ও সিজার করা হয়। পরবর্তীতে প্রয়োজন নেই তারপরও নানা জটিলতার কথা বলে রোগীকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। ঐ আইসিইউতে অক্সিজেন সিলিন্ডার ও নাকে পাইপ লাগিয়ে রাখা হয় দিনের পর দিন। কয়েক দিন পর শুধু আইসিইউর বিল বাবদ কয়েক লাখ টাকা স্বজনদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয়। এই বাণিজ্য দেশব্যাপী ব্যাপকহারে হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা এর সত্যতা স্বীকার করে বলেন, যখন অধিদপ্তর করা হয়, তখন ৮ টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছিল। তবে সব উপজেলায় সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছিল না বলেন তিনি। বেসরকারি হাসপাতাল হাতেগোনা কয়েকটি ছিল। বর্তমানে দেশব্যাপী সরকারি -বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিকের সংখ্যার তুলনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও এর অধিনস্থ স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রশাসন ব্যবস্থাপনা ও জনবল সীমিত। ঐ শীর্ষ কর্মকর্তার মতে যা মহাসমুদ্রে একফোটা পানি। চিকিৎসা সেবার নামে রাজধানী থেকে দেশব্যাপী গলাকাটা বাণিজ্য চলছে অনেক দিন ধরে। আদ-দ্বীন হাসপাতালের মত প্রাণহানির ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। সব ঘটনা জানা যায়না। মিডিয়ার বদৌলতে কিছু সংখ্যক ঘটনার প্রকাশ পায়। ঝড় উঠে সমালোচনার । বেশির ভাগ ঘটনাই ধামাচাপা পড়ে যায়।

অভিযোগ রয়েছে, বেশির ভাগ বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালনা হচ্ছে না এবং বেশির ভাগ ভবনও নীতিমালা অনুযায়ী তৈরি হয় না। এদিকে নিয়মিত মনিটরিং না করলেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিভাগীয় (স্বাস্থ্য) পরিচালক জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একশ্রেণী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়মিত ঐসব অবৈধ বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক ও ব্লাড ব্যাংক থেকে লাখ লাখ টাকা মাসোহারা পাচ্ছেন। এ সকল হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ব্লাড ব্যাংকের অনুমোদন আদৌ আছে কি না চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা খোঁজখবর কর্মকর্তারা রাখেন না বলেও অভিযোগ রয়েছে। নিয়মিত তাদের অফিসে উেকাচের টাকার প্যাকেট নির্ধারিত তারিখে পৌছে যায়। অব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠা এসব হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে গিয়ে রোগীর মৃত্যু, সিজার করতে গিয়ে মা ও শিশুর মৃত্যু কিংবা জেনারেল সার্জারি করতে গিয়েও অনেক রোগীর মৃত্যু হচ্ছে। অনেকে ভুল অপারেশন ও চিকিৎসায় পঙ্গুত্ববরণ কিংবা অঙ্গহানি হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর শিকার হয়। এছাড়া বেঁচে থেকে অনেকে অবর্ননীয় দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। তাদের পরিচর্যা করতে গিয়ে পরিবারের সদস্যরা চরম দুর্ভোগ এবং অর্থনৈতিক কষ্টের শিকার হচ্ছেন।

২৭ মে রাজধানীর মগবাজার আদ-দ্বীন হাসপাতালে ৬টি নবজাতকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে দেশব্যাপী আলোচনা সমালোচনার ঝড় উঠে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল গত বৃহস্পতিবার ছয় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে এক প্রেস ব্রিফিং-এ বলেন, আদ-দ্বীন হাসপাতালের অবকাঠামো ত্রুটি, কর্তব্যরত চিকিৎসক নার্সের দায়িত্বে অবহেলা ও অক্সিজেনের অভাব ৬ নবজাতকের মৃত্যুর জন্য দায়ী। তদন্তে উঠে এসেছে, আদ-দ্বীন হাসপাতাল ভবনটি চিকিৎসা সেবা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান হওয়ার মত উপযোগী নয়। খোদ রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই অব্যবস্থাপনার কারণে ছয় নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। রাজধানীর বাহিরে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর মধ্যে চিকিৎসা সেবার নামে কি হচ্ছে তা যেন দেখার কেউ নেই। ঐসব প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার গলাকাটা বাণিজ্য হচ্ছে। অপারেশনের পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। একশ্রেণীর চিকিৎসক কমিশনে ঐসব হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগী পাঠিয়ে ৬০ থেকে ৭০ ভাগ কমিশন নিয়মিত পাচ্ছেন। একাধিক ডায়াগনস্টিকের মালিক এ তথ্য জানিয়েছেন। কমিশন না দিলে চিকিৎসক পরীক্ষার জন্য রোগী পাঠাবেন না। ছোটবড় প্রায় সব ডায়াগনস্টিক সেন্টারেই কমবেশি একশ্রেণীর চিকিৎসক আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। বিদেশ যাওয়া ও বাসার খরচও পাচ্ছেন। এমন তথ্য পাওয়া যায়।

সম্প্রতি সুন্নতে খতনা করাতে গিয়ে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ছয় বছরের শিশু আয়ানের মৃত্যুর ঘটনাটি নিয়ে দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গিয়েছে। আদালত সব অনুমোদিত ও অননুমোদিত বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের তালিকা চেয়েছিল। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতাল, আগারগাঁও সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, কিডনি ইনস্টিটিউট, পঙ্গু হাসপাতালের আশেপাশে অর্থাত্ আসাদগেট ও মোহাম্মদপুর এলাকায় ৫ শতাধিক বেসরকারি ও ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে। ঐসব হাসপাতালে রয়েছে রোগী ভাগিয়ে নেওয়ার দালাল। রাজধানীর প্রায় সরকারি হাসপাতালগুলোতে জরুরি এবং বহির্বিভাগে সংঘবদ্ধ দালাল চক্র রয়েছে। রোগীদের এই হাসপাতালে ভাল চিকিৎসা হয় না সব পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসা পেতে দেরি হবে, চিকিৎসকরা ঠিকমত দেখেন না ও অপারেশন করতে অনেক সময় লাগবে। পাশে ক্লিনিক ও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা এবং অপারেশন করা কিংবা চিকিৎসা পেয়ে যাবেন। দ্রুত সুস্থ হয়ে ফিরে যাবেন। এই ধরনের প্রলোভন দিয়ে রোগীদের ভাগিয়ে নেয় দালালরা। প্রতিদিনই ঐসব হাসপাতালে সরেজমিনে গিয়ে দালাল চক্রের সদস্যের দেখা যায়। একাধিক দালাল জানায় যে, রোগী ভাগিয়ে নেওয়ার টাকা আমরা একা পাই না। কতিপয় ওয়ার্ড মাস্টার ও কর্মচারীকে দেওয়া হয়ে থাকে। ঐসব হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার ভবনগুলো ঝুকিপূর্ণ। সরেজমিনে দেখা যায় যে, ভাড়া করা বাসাবাড়িতে ছোট ছোট রুম, স্যাতস্যাতে ও নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। পরীক্ষা নিরীক্ষা যন্ত্রপাতি পুরাতন। অপারেশন থিয়েটার যন্ত্রপাতি পুরাতন।

ঢাকার বাইরে সকল সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, জেলা সদর, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রবেশ গেটের সামনে কিংবা দেওয়াল ঘেষে রয়েছে বেসরকারি ক্লিনিক, হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। ইত্তেফাকের স্থানীয় একাধিক প্রতিনিধি বলেন, চিকিৎসকের সামনে থেকে দালালরা ঐসব ক্লিনিকে রোগী ভাগিয়ে নিয়ে আসে। কতিপয় চিকিৎসক নিয়মিত ঐসব

সাইনবোর্ডধারী ক্লিনিক ও হাসপাতাল থেকে নিয়মিত মাসোহারা পান বলে অভিযোগ রয়েছে। ঐখানে ভুল চিকিৎসায় অনেকে মারা যায় বেশি অভিযোগ রয়েছে। ঢাকার বাইরে বিভাগীয় (স্বাস্থ্য) পরিচালক, জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একশ্রেণির কর্মকর্তার ঐসব ক্লিনিক ও হাসপাতাল থেকে নিয়মিত মাসোহারা পেয়ে থাকেন। এ কারনে এসব অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক নিয়ে বেশীর ভাগই মনিটর কিংবা তদারকি করেন না।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচারক অধ্যাপক ডাঃ প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, যখন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করা হয় তখন দেশে ৮টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছিল। এখন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সংখ্যা বেড়েছে। ঐসময় সিভিল সার্জন ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তারা মনিটর করতেন। সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ১০৫ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং ১৫ সহস্রাধিক ক্লিনিক ডায়াগনোস্টিক সেন্টার ও ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। অনেকের লাইসেন্স নেই এবং যাদের আছে তারা নবায়ন করে নাই। সীমিত জনবল দিয়ে এই বিশাল চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা নিয়মিত মনিটর সম্ভব নয়। অধিদপ্তরের শুধু হাসপাতাল বিভাগকে আলাদা অধিদপ্তর করা সময়ের চাহিদা প্রয়োজন বলে তিনি জানান। অধিদপ্তরের পরিধি আর বৃদ্ধি করাও জরুরি। সরকারি বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত মনিটর করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (শিক্ষা) অধ্যাপক ডাঃ সুমন নাজমুল বলেন, বর্তমানে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তুলনা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সীমিত জনবল দিয়ে মনিটর করা কষ্টকর। এই সংস্থা জনবল ও চাহিদা অনুযায়ী পরিধি আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

জনস্বাস্থ্যবিদ সাবেক পরিচালক ডাঃ বেনজীর আহমেদ বলেন, শুধু ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মত প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা দফতর প্রয়োজন। আগে ৮টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ছিল। বর্তমানে শতগুণ চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিধি বেড়েছে। সেই তুলনায় জনবল ও অবকাঠামো বৃদ্ধি ছাড়া অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম কমবে না।